بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

খুতবা জুম'আ

প্রথম কথা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার বা অনুশীলনের ভিত্তি হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে রোযা সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তিকে সামনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৩রা জুন ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন,ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তিন চার দিনের মাঝে পবিত্র রমযান মাস আরম্ভ হতে যাচ্ছে। রোযা ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলোর একটি,আর তা পূর্ণ করাও আবশ্যক। রোযা সম্পর্কে কিছু ছোট ছোট প্রশ্নেরও অবতারণা হয়, সেহরীর সময় সম্পর্কে,ইফতারের সময় সম্পর্কে,অসুস্থতা সম্পর্কে,অনুরূপভাবে মুসাফির সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে হাকাম এবং সুবিচারক বা ন্যায় বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন যার ইসলামী শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত করার ছিল এবং তিনি তা করেছেন। আর একইভাবে তার সকল বিষয়ের সকল সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করার কথা ছিল আর তিনি তা করেছেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ যুগে বিভিন্ন মাসলা মাসায়েলের সমাধান এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আমাদের তাঁর প্রতি দেখা উচিত বা তাকানো উচিত। রোযার দৃষ্টিকোণ থেকে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠানো হয়, এ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অবস্থান কি ছিল বা তিনি কি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর ফতোয়া কি ছিল,এখন আমি সে সম্পর্কে আলোচনা করব।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, প্রথম কথা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষা মেনে চলার বা অনুশীলনের ভিত্তি হলো তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়াকে দৃষ্টিতে রেখে রোযা সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই উক্তিকে সামনে রাখুন যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য নিষ্ঠার সাথে রোযা রাখ। একবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নিকট প্রশ্ন করা হয়, রোযা বুধবারে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমাদের এখানে প্রথম রোযা রাখা হয়েছে বৃহস্পতিবারে এখন কি করা উচিত? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এর জন্য রমযানের পর একটি রোযা রাখতে হবে, যে রোযা রয়ে গেছে তা রমযানের পর রাখ।

অনুরূপভাবে সেহরী খাওয়ার বিষয় রয়েছে, সেহরী খেয়ে রোযা রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়েছেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) বলেছেন, রোযার সময় সেহরী খেয়ো কেননা সেহরী খেয়ে রোযা রাখাতে কল্যাণ নিহিত আছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও এই রীতি অনুসরণ করতেন আর জামাতের সদস্যদের এবং বন্ধুদেরও এই নসীহত করতেন। অনুরূপভাবে কাদিয়ানে যে সমস্ত অতিথিরা আসতেন তাদের জন্য রীতিমত সেহরীর ব্যবস্থা থাকতো বরং খুব ভালোভাবে ব্যবস্থা করা হতো।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৬) আমাদের জন্য অসহ্য যে, তোমরা ঈমান আনবে আর কষ্টের মাঝে পড়ে থাকবে, তাই রোযা আবশ্যক করেছি, আল্লাহ্ তা'লা বলছেন এ কথা, যেন তোমাদের কষ্ট এবং অস্বাচ্ছন্দ দূরীভূত হয়। এটি এমন একটি কথা যা মু'মিনকে মু'মিন বানায়। এ কথাও স্মরণ রাখার যোগ্য যে, তিনি তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ বা সহজসাধ্যতা চান, কষ্ট নয়। এর ব্যাখ্যা কি? এটি এমন একটি গুণ বা যোগ্যতা যা মু'মিনকে মু'মিন বানায়, আর তা হলো রোযায় ক্ষুধার্ত থাকা বা ধর্মের খাতিরে কুরবানী করা মানুষের জন্য ক্ষতির কোন কারণ নয় বরং এটি সম্পূর্ণভাবে কল্যাণকর বিষয়। যে মনে করে যে, রমযানে মানুষ

ক্ষুধার্ত থাকে সে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, এ জন্য আমি রমযান নির্ধারণ করেছি যেন তোমরা রুটি খেতে পার। অতএব বোঝা গেল রুটি বা খাবার হলো সেটি যা আল্লাহ্ তা'লা খাওয়ান। আর এর সাথেই প্রকৃত জীবনের সম্পর্ক, এছাড়া যেই খাবার রয়েছে তা রুটি নয়, তা পাথর, যা তার আহারকারীর জন্য ধ্বংসের কারণ। মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো যে গ্রাশইতার মুখে যায় তার দেখা উচিত যে, তা কার জন্য, যদি আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটিই খাবার, আর যদি প্রবৃত্তির জন্য হয়ে থাকে তাহলে সেটি খাবার নয়।

সুতরাং সেহরী যদি খোদার নির্দেশে খাওয়া হয় আর ভালোও খাওয়া হয় তাহলে তা খোদার সন্তুষ্টির জন্য। আর মহানবী (সা.) যেভাবে বলেছেন, এতে কল্যাণ নিহিত থাকবে। আর যদি শুধু উদরপূর্তি করা উদ্দেশ্য হয় আর ভালো খাবার খাওয়া উদ্দেশ্য হয়, স্বাদ পাওয়া উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা প্রবৃত্তির জন্য। সফর এবং অসুস্থতায় রোযা রাখা বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, আমার ভালোভাবে মনে পড়ে, খুব সম্ভব মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, যিনি আজকাল একজন নেত্রীস্থানীয় লাহোরী, একবার বাহির থেকে আসেন। আসরের সময় ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জোর দেন যে, রোযা ভেঙ্গে ফেল, তিনি বলেন, সফরে রোযা রাখা বৈধ নয়। একইভাবে একবার অসুস্থতার প্রশ্ন আসলে তিনি বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী হলো ধর্ম যে ছাড় দিয়েছে সেগুলো কাজে লাগানো উচিত। ধর্ম কাঠিন্য নয় বরং স্বাচ্ছন্দ শিখায়, সহজসাধ্যতা শেখায়। অনেকে বলে যে, মুসাফির ও অসুস্থরা যদি রোযা রাখতে পারে তাহলে রাখা উচিত, আমরা এটিকে সঠিক মনে করি না।

একস্থানে অবস্থান কালে রোযা সম্পর্কে হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ্ সাহেব বলেন, রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির এক জায়গায় তিন দিনের অধিককাল পর্যন্ত অবস্থান করতে হয় তাহলে তার রোযা রাখা উচিত। তিন দিনের কম যদি থাকতে হয় তাহলে রোযা রাখা উচিত নয়। আর কাদিয়ানে যদি স্বল্পকাল অবস্থান সত্ত্বেও কেউ রোযা রাখে তাহলে পরে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই কেননা কাদিয়ান দ্বিতীয় মাতৃভূমি, এখানে তিন দিনের কমেও যদি কেউ রোযা রাখতে চায়, রাখতে পারে, কিন্তু অন্যস্থানে তিন দিন অবস্থান থাকলে রোযা রাখতে পারবে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অধিবেশনে রুগ্ন এবং মুসাফিরের রোযা রাখার কথা উঠে, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলেন, তিনি পূর্বের কথাই শুনিয়েছেন যে, শেখ ইবনে আরাবীর উক্তি রয়েছে যে, রুগ্ন এবং মুসাফির যদি রোযার সময় রোযা রাখে তাহলে সুস্থতা ফিরে আসার পর রমযানের পর তার জন্য পুনরায় রোযা রাখা আবশ্যক, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ (সূরা আল্-বাকারা: ১৮৫) অর্থাৎ তোমাদের মাঝে যারা অসুস্থ্য বা সফরে থাকে তারা রমযান মাসের দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর রোযা রাখবে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা এ কথা বলেন নি যে, রুগ্ন ব্যক্তি বা মুসাফির যদি নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে বা নিজের বাসনা পূর্ণ করতঃ এই দিনগুলিতে রোযা রাখে তাহলে পরবর্তীতে আর রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তা'লার স্পষ্ট নির্দেশ হলো, সে পরেও রোযা রাখবে বা তাকে পরেও রোযা রাখতে হবে, পরের রোযা রাখা তার জন্য আবশ্যক। মধ্যবর্তী রোযা যদি সে রাখে এটি তার জন্য অতিরিক্ত একটি বিষয়, এটি তার নিজেরই সিদ্ধান্ত, এর ফলে পরে রোযা রাখা সম্পর্কে খোদার যে নির্দেশ রয়েছে সেটি টলতে পারে না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি সফর এবং অসুস্থতার অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে আল্লাহ্র স্পষ্ট নির্দেশের অবাধ্যতা করে। নির্দেশ হলো রুগ্ন এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে,সুস্থ্য হওয়ার পর আর সফর সমাপ্তির পর সে রোযা রাখবে। আল্লাহ্র এই নির্দেশ মেনে চলা উচিত, কেননা পরিত্রাণ লাভ হয় খোদার অনুগ্রহে, কর্মবলে কেউ মুক্তি পেতে পারে না। তিনি বলেন, খোদা তা'লা এই কথা বলেন নি যে, রোগ সামান্য না বেশি, সফর সংক্ষিপ্ত নাকি দীর্ঘ, বরং এটি সার্বজনীন একটি নির্দেশ, এটি মেনে চলা উচিত। রুগী এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তারা নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী হবে।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই লেখেন, মিঞাঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন যে, প্রথম যুগের কথা, একবার রমযান মাসে এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কোন মেহমান আসে। তিনি রোযা রেখেছিলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছিল, খুব সম্ভব আসরের পরের কথা এটি। হুযূর তাকে বলেন যে, আপনি রোযা খুলে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলেন যে, সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, রোযা খুলে কি লাভ। হুযূর বলেন, আপনি কি বাহুবলে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চান? খোদা তা'লাকে সংকল্পবলে সন্তুষ্ট করা যায়

না, বরং তাঁকে আনুগত্যের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, মুসাফির রোযা রাখবে না, সেখানে রোযা রাখা উচিত নয়। তখন সেই ব্যক্তি রোযা খুলে ফেলেন।

অসুস্থ্য হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রক্তচাপ কমে যায় আর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে। তখন সূর্য ডুবন্ত প্রায় ছিল, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রোযা খুলে ফেলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, এই অধম বর্ণনা করছে যে, হাদীসে হযরত আয়েশার (রা.) রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) সম্পর্কে এটিই দেখা যায় যে, তিনি সব সময় দু'টো বৈধ পথের মাঝে সহজ পথকে প্রাধান্য দিতেন।

অনেক সময় রমযান মাস এমন মৌসুমে আসে যখন কৃষকদের কাজ অনেক বেশি থাকে, যেমন ফসল রোপন বা ফসল লাগানো বা কাটার ঋতু বা মৌসুম হয়ে থাকে। যারা শ্রমজীবী এমন শ্রমিকদের জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয় না, এ সম্পর্কে শিক্ষা কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, **'আল আ'মালু বিন্ নিয়্যাত'** এরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে, তাকওয়া এবং পবিত্রতার নিরিখে নিজের অবস্থা মানুষ যাচাই করতে পারে, কেউ যদি মজদুরী করা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে তাহলে তার রাখা উচিত নতুবা সে অন্যদের মাঝে গণ্য হবে, এরপর যখন সুযোগ হয় রাখতে পারে।

রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একবার আমার হৃদয়ে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে, তখন বুঝতে পারলাম যে, তৌফিক এবং সামর্থ্য লাভের জন্য, যেন রোযা রাখার সামর্থ্য লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই মানুষকে সামর্থ্য দিয়ে থাকে। সব কিছু খোদার কাছেই যাচনা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সর্ব শক্তিমান, তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রুগীকেও রোযার সামর্থ্য দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্য এটিই, যেন সামর্থ্য লাভ হয়। এটি খোদার বিশেষ অনুগ্রহে হয়ে থাকে। তাই আমার মতে এই দোয়া করা কতই না উত্তম বিষয় যে, হে আল্লাহ্! এটি তোমার এক পবিত্র মাস, আর আমি এই মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, আমি জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কি না বা এই ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রাখতে পারব কি না। আর সে যদি আল্লাহ্র কাছে সামর্থ্য যাচনা করে তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার সামর্থ্য দান করবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না বা যে সক্ষম নয় তার এর বিনিময়ে মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হয়, এ খাতে যা ব্যয় হয় তা এতিম ফান্ডে বা এতিম তহবিলে অথবা জামাতের ব্যবস্থাপনার হাতে সেই পয়সা দেয়া বৈধ কি না? হুযূর বলেন, একই কথা, শহরে মিসকীনকেও খাওয়াতে পারে বা এতিম ও মিসীকন ফান্ডেও দিতে পারে, কোন পরিচিত ব্যক্তির যদি রোযা খোলাতে হয় বা ইফতার করাতে হয় তাহলে তাও করানো যেতে পারে।

অজান্তে খেলে বা পান করলে রোযা নষ্ট হয় না, এই বিষয়ে তাঁর সামনে একটি চিঠি উপস্থাপন করা হয় যে,রমযান মাসে সেহরীর সময় অজান্তে ভিতরে বসে খাওয়া অব্যাহত রাখি আর বাহিরে বেরিয়ে দেখি যে, শুভ্রতা প্রকাশ পেয়ে গেছে, আমার জন্য সেই রোযা পরে রাখা আবশ্যক কি না, তিনি দীর্ঘক্ষণ সেহরী খেতে থাকেন। উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, অজান্তে খেলে বা পান করলে সেই রোযার স্থলে দ্বিতীয় রোযা রাখা আবশ্যক নয়। ভুলবসতঃ খেলে কোন অসুবিধা নেই।

বয়সের প্রশ্ন যে, কোন্ বয়সে রোযা রাখা উচিত, অনেক বাচ্চারাও জিজ্ঞেস করে আর বয়স্করাও, মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়ত কম বয়স্কদের রোযা রাখতে বারণ করেছে কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে রোযা রাখার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত। তিনি বলেন, আমার যতটা মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ১২ বা ১৩ বছর বয়সে প্রথম রোযার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কোন কোন নির্বোধ ৬/৭ বছরের শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করে আর মনে করে যে, আমরা পুণ্যের ভাগী হব। এটি পুণ্য নয় বরং এটি একটি অন্যায়। কেননা এটি দৈহিক উন্নতি ও বিকাশের বয়স। অবশ্য যৌবনে পদার্পনের নিকটবর্তী সময়ে, যখন রোযা আবশ্যক হওয়ার দিন সন্নিকটে থাকে তখন রোযার চর্চা অবশ্যই করানো উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতিকে যদি দেখা হয় তাহলে ১২/১৩ বছর বয়সে কিছু অভ্যাস করানো উচিত এবং প্রত্যেক বছর কয়েকটি রোযা রাখানো উচিত যতদিন না বয়স ১৮ হয়, যা আমার মতে রোযার জন্য পূর্ণ বয়স। প্রথম বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শুধু একটি রোযা

রাখার অনুমতি দিয়েছেন, অর্থাৎ ১২/১৩ বছর বয়সে হুযূর শুধু ১টি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। হুজুর (আইঃ) বলেন, যখন রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন ১২/১৩ বছর বয়সে তখন শুধু ১টি রোযা রাখতে দিয়েছেন এ বয়সে শুধু রোযার একটা আগ্রহ থাকে, সেই আগ্রহের কারণে বাচ্চারা বা ছেলে-মেয়েরা বেশি রোযা রাখতে চায়, তখন পিতা-মাতার উচিত তাদের বারণ করা। এরপর বয়সের এক পর্যায়ে বাচ্চাদের সাহস যোগানো উচিত যে, অবশ্যই কয়েকটি হলেও রোযা রাখা উচিত, কিন্তু শৈশবে বারণ করা উচিত, বেশি রোযা রাখতে দেয়া উচিত নয়। আর যখন যৌবনে পদার্পন করে তখন উৎসাহিত করা উচিত, একই সাথে দেখা উচিত যে, বেশি রোযা যেন না রাখে। আর যারা দেখে তাদের আপত্তি করা উচিত নয় যে, সব রোযা কেন রাখে না। কেননা কিশোর কিশোরীরা যদি এই বয়সে সব রোযা রাখে তাহলে পরে আর রাখতে পারবে না, অনুরূপভাবে কোন কোন ছেলে মেয়ে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে, আমি দেখেছি অনেকেই তাদের ছেলে-মেয়েদের সাক্ষাতের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে, আর বলে যে, এর বয়স ১৫ বছর অথচ দেখতে মনে হয় ৭/৮ বছর বয়স্ক। আমার কাছেও এমন অনেকেই আসে। তিনি বলেন, আমি মনে করি এমন ছেলে মেয়ে ২১ বছর বয়সে রোযার জন্য সাবালক হবে। পক্ষান্তরে এক সুঠাম বালক হয়ত ১৫ বছর বয়সেই ১৮ বছর মনে হয় কিন্তু যদি আমার এই শব্দগুলো নিয়ে সে বসে যায় যে, রোযার জন্য সাবালক হওয়ার বয়স হলো ১৮ তাহলে সে আমার ওপরও জুলুম করবে না আর খোদার বিরুদ্ধেও অন্যায় করবে না, বরং নিজ প্রাণের ওপর নিজেই অন্যায় করবে। অনুরূপভাবে কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকা যদি রোযা না রাখে আর মানুষ তাকে সমালোচনা করে তাহলে এমন সমালোচনাকারী নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করবে। তারাবী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। গোলেকীর আকমল সাহেব লিখিতভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, রমযান শরীফে রাতে উঠা এবং নামায পড়ার তাকিদ রয়েছে, কিন্তু সচরাচর পরিশ্রমী মজদুর বা শ্রমিক ও কৃষকরা এমন কাজের ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদেরকে রাতের প্রথম অংশে যদি তাহাজ্জুদের পরিবর্তে ১১ রাকাত নামায পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে কি না। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, কোন অসুবিধা নেই, তাদের পড়ে নেওয়া উচিত।

তারাবী সম্পর্কে নিবেদন করা হয় যে, এটি যেহেতু তাহাজ্জুদ তাই ২০ রাকাত পড়া সম্পর্কে হুযূরের মতামত কি, তাহাজ্জুদ তো বিতরসহ ১১ বা ১৩ রাকাত। তিনি বলেন যে, রসূল করীম (সা.)-এর স্থায়ী রীতি হলো ৮ রাকাত পড়ার, তিনি তাহাজ্জুদের সময়ই তা পড়তেন আর এটিই উত্তম। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়াও বৈধ, তাহাজ্জুদের সময় উঠে ৮ রাকাত পড়াই যুক্তিযুক্ত বা যথোচিত, কিন্তু রাতের প্রথম অংশে পড়লেও তা বৈধ, অর্থাৎ ঘুমানোর পূর্বে। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এটি পড়েছেন। ২০ রাকাত পরে পড়া হয়েছে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতি তাই ছিল যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ২০ রাকাত বা বেশি রাকাত সংক্রান্ত কথাগুলো পরের। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি হলো ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ পড়া। এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে একটি পত্র লেখে যার সারাংশ হলো, সফরে কিভাবে নামায পড়তে হয় আর তারাবী সম্পর্কে কি নির্দেশ? তিনি বলেন, সফরে দু'রাকাত নামায পড়াই সুন্নত, আর তারাবীও সুন্নত তাই তাও পড়ুন, ঘরে একাও পড়তে পারেন।

খুতবা জুমুআর শেষে হুজুর (আইঃ) বলেন, অতএব, রমযান সংক্রান্ত এই কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে খোদার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করে রমযানের রোযা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 3rd June, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B